বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

ইউনিট ৮

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অপরিহার্য। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দশ বার জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ অনেকগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়েছে। তবে সব সময় নির্বাচন সুষ্ঠু হয় নি। ক্ষমতার পালা বদল নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে সমস্যাটি নির্বাচন ব্যবস্থার মনে হলেও বিশেষজ্ঞগণ মূলত সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার অভাবকেই এ জন্য দায়ী করেন। জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব বলেও তারা মনে করেন। এ ইউনিটে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর নানা দিক এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন, সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১: বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
পাঠ-২: প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৩
পাঠ-৩: দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯
পাঠ-৪: তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬
পাঠ-৫: চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৮
পাঠ-৬: পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১
পাঠ-৭: সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬ (জুন)
পাঠ-৮: অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১
পাঠ-৯: নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮
পাঠ-১০: দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪
পাঠ-১১: সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা
পাঠ-১২: সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা

পাঠ-৮.১ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রকৃতি জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ইতিহাস বলতে পারবেন।
- এ পর্যন্ত কি কি ধরনের নির্বাচন হয়েছে তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জনমত, সংসদীয় পদ্ধতি, সাংবিধানিক, নিরপেক্ষ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি,

একটি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের মাপকাঠি স্বরূপ। সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনমতের প্রতিফলন ঘটে এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে নির্বাচনী সংস্থা হল নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বিদ্যমান। তাই সরকার গঠনে নির্দিষ্ট সময় পর পর জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও স্থানীয় উভয় ধরনের নির্বাচনই পরিচালনা করে থাকে।

সাংবিধানিক : বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে সাংবিধানিকভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সংবিধানের সপ্তম ভাগে ১১৮ থেকে ১২৬ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের গঠন, কার্যাবলি সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ করার জন্য শাসন বিভাগের সার্বক্ষণিক সহযোগিতার বিষয়টিও সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষঃ বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশন গঠন ও নিয়োগ দিয়ে থাকেন। নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্ব হল নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন নিয়ে বিতর্কের আজও অবসান হয় নি। দু'একটি ব্যতীত প্রত্যেকটি কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক গুলোর মতানৈক্য দেখা গেছে।

এককেন্দ্রিকঃ বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন এককেন্দ্রিক। তবে দেশের প্রত্যেকটি উপজেলায় এর প্রশাসনিক কার্যালয় রয়েছে। স্থানীয় কার্যালয়গুলো কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সকল পর্যায়ের নির্বাচনেই কেন্দ্রিয় কার্যালয়ের ভূমিকা থাকে।

বাংলাদেশে নির্বাচন :

স্বাধীনতার পর থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশেষ কয়েকটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান বাংলাদেশের নির্বাচনি ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দশ বার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া জনগণের ভোটে ৩ বার (১৯৭৮,১৯৮১ ও ১৯৮৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ৩ বার (১৯৭৭, ১৯৮৫ ও ১৯৯১) গণভোটসহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশে নির্বাচনের প্রকৃতিকে দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। প্রথমত, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন পূর্ব পর্যায় এবং দ্বিতীয়ত, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন পরবর্তী পর্যায়।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন পূর্ব পর্যায় (১৯৭২-১৯৯০)

১৯৭২ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি বেশির ভাগ সময়ই অস্থিতিশীল ছিল। ১৯৭১ থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বেসামরিক সরকার বিদ্যমান ছিল। এ সময়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার টুটি চেপে ধরা হয়। জারি করা হয় সামরিক শাসন। ১৯৭৫ থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসকেরা নিজেদের ইচ্ছামাফিক নির্বাচন ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে। এর ফলে নির্বাচন ব্যবস্থাও সে ভাবে গড়ে উঠতে পারেনি।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন পরবর্তী পর্যায় (১৯৯১-২০১৬)

১৯৯১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম চারটি নির্বাচন অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪ সালের নির্বাচনটি বিশ্বের অন্যান্য সংসদীয় পদ্ধতির দেশের মতই নির্বাচিত ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়।

স্বাধীনতার পর থেকে স্থানীয় ও জাতীয় মিলে অনেকগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচনের নজির অনেক। কিন্তু নির্বাচনপূর্ব ও নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের ধারাকে ম্লান করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাই বেশি বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত কোন কোন পর্যায়ের নির্বাচন হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১০ বার জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে। এছাড়া তিনটি গণভোট, তিনটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়েছে। সামরিক-বেসামরিক আমলের একাধিক নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আবার এদেশে বিশ্বনন্দিত নির্বাচনও হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই প্রতিফলন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে কত বছর বয়স্ক নাগরিকদের ভোটদানের অধিকার রয়েছে?
(ক) ১৬ বছর (খ) ১৮ বছর
(গ) ২০ বছর (ঘ) ২২ বছর

২। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে-
i. ভোটার তালিকা সংশোধন
ii. ব্যালট বাক্স ব্যবহার
iii. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ শাসন ক্ষমতায় কীভাবে অংশগ্রহণ করে?
(ক) প্রত্যক্ষভাবে (খ) পরোক্ষভাবে
(গ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে (ঘ) প্রশাসনের সহায়তায়

৪। নির্বাচন একটি-
i. প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া
ii. প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া
iii. জনমত যাচাই প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। বাংলাদেশের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হলো-
i. সর্বজনীন ভোটাধিকার
ii. গোপন ভোটপদ্ধতি
iii. একক নির্বাচনী এলাকা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.২ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৩

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- এর গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মুজিবনগর সরকার, সংবিধান, সম্মোহনী নেতৃত্ব, আওয়ামী লীগ, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন। ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পূর্বে মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত মুজিবনগর সরকার কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ জন্য প্রথমেই একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মাত্র নয় মাসের প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। বিচারপতি এম ইদ্রিস কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। তারপর নতুন সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠানঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ তারিখেই বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০০টি আসনের মোট ১৪টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ নির্বাচনে ১০৮৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

নির্বাচনের ফলাফলঃ

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	মনোনীত প্রার্থী	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	২৯৩	৭৩.২
২.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৩৭	০১	৬.৫২
৩.	ন্যাপ (মোজাফফর)	২২৪	--	৮.৩৩
৪.	ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৯	--	৫.৩২
৫.	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	০৮	০১	০.৩৩
৬.	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	০৪	--	০.২৫
৭.	বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি	০৩	--	০.০৬
৮.	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী)	০২	--	০.১০
৯.	অন্যান্য	১২০	০৫	৫.৫২
	মোট	১০৭৮	৩০০	১০০

সূত্রঃ বাংলাপিডিয়া, জুলাই-২০১৭।

নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ছিল অজেয়। ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৩ টিতেই আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। বিরোধী দলীয় প্রায় সকল প্রার্থীই পরাজিত হয়।

কেবল প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান খান বাংলাদেশ জাতীয় লীগের প্রার্থী হিসেবে জয় লাভ করেন। সংরক্ষিত ১৫টি নারী আসনেরও সবকটিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।

নির্বাচনের গুরুত্বঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে এটাই ধারণা ছিল। হয়েছেও তাই। বঙ্গবন্ধুর অবদান, ব্যক্তি ইমেজ, সম্মোহনী নেতৃত্ব, স্বাধীনতায় নেতৃত্বদান এবং আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ভিত্তি অনেক প্রভাব ফেলেছে। নির্বাচনে কারচুপি ও ব্যালট ছিনতাইয়ের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও এ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তেমন প্রশ্ন ওঠে নি। কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে এ নির্বাচন জরুরি ছিল। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘ দিনের প্রাণের দাবি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭৩ সালের নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধার বহি:প্রকাশ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গঠনে এ নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গুরুত্ব লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭৩ সালের নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়। জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে ভোট প্রয়োগ করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে জনগণ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করে। বিচ্ছিন্ন কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনার কথা বাদ দিলে, এই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তেমন প্রশ্ন ওঠে নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?

(ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (খ) ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি (মোজাফফর)

(গ) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় লীগ

২। বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করার কারণ-

i. বঙ্গবন্ধুর ব্যাপক জনপ্রিয়তা

ii. মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বদান

iii. অন্য কোন রাজনৈতিক দল না থাকায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। কোন নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক দাবি বাস্তবরূপ লাভ করে?

(ক) ১৯৭৩ সালের নির্বাচন (খ) ১৯৭৯ সালের নির্বাচন

(গ) ১৯৮৬ সালের নির্বাচন (ঘ) ১৯৮৮ সালের নির্বাচন

পাঠ-৮.৩ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭৯ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বৈধতার সঙ্কট, দল গঠন, নির্বাচন, সামরিক বাহিনী

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দৃশ্যত কতিপয় বিপদগামী সামরিক কর্মকর্তাদের ঘৃন্য ষড়যন্ত্র ও অংশগ্রহণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। এ নারকীয় হত্যাযজ্ঞ বাংলাদেশের রাজনীতিকেও এক অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সামরিক বাহিনী। অভ্যূত্থানকারীরা খন্দকার মোশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে এবং ১৫ আগস্টই ২২ সদস্যের মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেন। ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ তারিখে ১৫ই আগস্টের অভ্যূত্থানকারীদের বিরুদ্ধে একটি সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এই সেনা অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ। কিন্তু খালেদ মোশাররফও বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেন নি। মাত্র ৩ দিন পর অর্থাৎ ৭ নভেম্বর সংঘটিত পাল্টা অভ্যুত্থানে প্রাণ হারান খালেদ মোশাররফ। এই ধারাবাহিকতায় ক্ষমতার দখল নিয়ে নেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি বিচারপতি আবু সাদাত সায়েমকে সামনে রেখে ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ নেন। জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক শাসন পরিচালনা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমের জন্য নির্বাচন, দল গঠনসহ নানা কর্মকান্ড শুরু করেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে সংঘটিত সেনা অভ্যুত্থানে প্রাণ হারান জিয়াউর রহমান।

বৈধতার সঙ্কট অতিক্রম চেষ্টার অংশ হিসেবে ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যভিত্তিক একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন জিয়াউর রহমান। ক্ষমতার মসনদ থেকে গঠন করা দলটির নামকরণ করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দল গঠনের পরেই ১৭ নভেম্বর রাজনৈতিক কর্মসূচির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন। তিনি এই ধারাবাহিকতাতে ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধী দলগুলোর চাপের মুখে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের তারিখ পুন:নির্ধারিত হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান:

নির্ধারিত দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক দল শাসকের ছত্র-ছায়াতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৫০.৯৫ ভাগ ভোট পড়ে। নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক ও উপদল অংশ গ্রহণ করে। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনে ২১১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৩০০টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ২০৭টি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক) ৩৯টি, মুসলিম ডেমোক্রেটিক লীগ ২০টি, জাসদ ৮টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৬ টি আসন লাভ করে (সূত্র: বাংলাপিডিয়া, জুলাই-২০১৭)। সংরক্ষিত আসনের ৩০টি আসনই বিএনপি পায়। বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পরবর্তীতে বিএনপিতে যোগদান করে। ৪টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যার মধ্যে ৩টি আসনে বিএনপি প্রার্থী এবং ১টি আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থী জয় লাভ করে। এই নির্বাচনের মাত্র ছয় মাস পূর্বে গঠিত হওয়া নিজ দল বিএনপি'র প্রার্থীদের জেতানোর জন্য সকল ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন জিয়াউর রহমান।

নির্বাচনের গুরুত্বঃ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘন ঘন পরিবর্তন হতে থাকে। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক ক্ষমতা দখল ও বেসামরিকীকরণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা কোন সুসংহত রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। বরং জিয়াউর রহমানের এ ধরণের কার্যকলাপ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপকে উৎসাহিত করে। উল্লেখ্য, জিয়াউর রহমান তাঁর মন্ত্রিসভায় ও প্রশাসনে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাহীন অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালের নির্বাচন রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জিয়াউর রহমান কর্তৃক রাজনৈতিক দল গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

জাতির জনকের হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা বৈধ গণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে অবৈধ ক্ষমতা দখলদার সেনা শাসকদের হাতে চলে যায়। প্রথম সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেই বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ নিতে থাকেন। ক্ষমতায় থেকে দল গঠন এবং একের পর এক নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দখলকৃত ক্ষমতাকে বৈধরূপ দেয়ার চেষ্টা চালান জিয়াউর রহমান। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই প্রচেষ্টারই একটি ধাপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত তারিখে?

(ক) ১৯৭৮ সালের ৫ জানুয়ারি (খ) ১৯৮৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি

(গ) ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি (ঘ) ১৯৮১ সালের ৭ মার্চ

২। ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ এর অভ্যুত্থানে কে নেতৃত্ব দেন?

(ক) মেজর ডালিম (খ) খালেদ মোশাররফ

(গ) জিয়াউর রহমান (ঘ) কর্ণেল তাহের

৩। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে কতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে?

(ক) ১৫১৪ জন (খ) ২,০০০ জন

(গ) ২১১৫ জন (ঘ) ২৩৫২ জন

পাঠ-৮.৪ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৮৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- ১৯৮৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বেসমারিকীকরণ, বৈধতার সঙ্কট, দল গঠন, নির্বাচন, জালিয়াতি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর দেশে নেতৃত্বের চরম সংকট তৈরি হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রথম সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান এক সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হন। এই ঘটনার এক বছরের কম সময়ের মধ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। অন্যান্য সামরিক শাসনের মত এরশাদও বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমের জন্য বেসমারিককরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। কিন্তু তিনি নানাবিধ আন্দোলন সংগ্রামের সম্মুখীন হন। প্রথমে তিনি বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন করেন। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পৌরসভা ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দল গঠন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনার অনুমতি দেন এরশাদ। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সাধারণ জনগণ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজ অবস্থানের ম্যান্ডেড নেবার জন্য ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটের আয়োজন করেন। এই গণভোটে সব ধরনের কারচুপি করে ৯৪.১৪ ভাগ আস্থা ভোট লাভ করেন এরশাদ।

তাঁর পূর্বসূরী জিয়ার মতই দল গঠন ও নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। সিংহ ভাগ রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মুখে পূর্বঘোষিত সময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেননি। কিন্তু স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে একটা আবহ তৈরি করায় উদ্যোগী হন। ১৯৮৫ সালের মে মাসে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান:

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মুখে তিন দফা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হয়। নির্বাচনের তারিখ প্রথমে ঘোষিত হয় ১৯৮৪ সালের ২৬ এপ্রিল। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ ছোট-বড় ২৮টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে ৩০০ আসনের জন্য ২১৫৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৫২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৫৩ জন। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন। এ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটের নির্বাচন বর্জন।

নির্বাচনের ফলাফল:

নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩ আসন পেয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কারচুপি, মিডিয়া ক্যুসহ বিভিন্ন রকমের অভিযোগ তোলে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৬.১৫ ভাগ ভোট পেয়ে ৭৬ টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮৬ এর নির্বাচনকে প্রহসন ও ভোট ডাকাতির নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেন।

নির্বাচন মূল্যায়ন :

অবৈধভাবে ক্ষমতার দখলদার এরশাদের পক্ষে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। বৈধতার সঙ্কট অতিক্রম এবং দেশজুড়ে অনুগ্রহভোগী তৈরি করার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন এরশাদ।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৮৬ সালের নির্বাচনের পটভূমি তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৮২ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পর থেকেই ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এরশাদ। তবে প্রথম থেকেই রাজনৈতিক দলগুলো এর বিরোধীতায় আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু সামরিক জান্তা এ আন্দোলনের মধ্যেই ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করে। কারচুপি ও সহিংসতার মাধ্যমে এরশাদের জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। জাতীয় পার্টি সরকার গঠন করে কিন্তু দেশের পরিস্থিতি তাতে মোটেও শান্ত হয় নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচন কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়?

(ক) ৮ এপ্রিল (খ) ৭ মে

(গ) ২২ সেপ্টেম্বর (ঘ) ১৮ নভেম্বর

২। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে-

i. আওয়ামী লীগ

ii. বিএনপি

iii. জামায়াতে ইসলামী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য এরশাদ কাকে অনুসরণ করেন?

ক) শেরে বাংলা খ) মাওলানা ভাসানী

গ) বঙ্গবন্ধু ঘ) জিয়াউর রহমান

পাঠ-৮.৫ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৮

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৮৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- ১৯৮৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বেসামরিকীকরণ, আন্দোলন, বয়কট, ভোটারবিহীন।

১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও এরশাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলন অব্যাহত থাকে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে এরশাদের পদত্যাগের দাবি জোরালো হতে থাকে।

১৯৮৭ সালের নভেম্বরে বিরোধী দলগুলো জাতীয় সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করলে, এরশাদ ২৭ নভেম্বর দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ৬ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে ১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পরে তা পিছিয়ে ৩ মার্চ করা হয়। বিদ্যমান অবস্থায় এই নির্বাচনের প্রতি সিংহভাগ রাজনৈতিক দলের কোন সমর্থন ছিল না। তাই তারা নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আন্দোলন দুর্বল করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ও বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়াকে অন্তরীণ করা হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান:

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বয়কট করায় এ নির্বাচনে জনগণের আগ্রহ ছিল না। মাত্র ৯টি নাম সর্বস্ব দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এতে জাতীয় পার্টি ২৫১টি, আ. স. ম. আবদুর রবের নেতৃত্বাধীন সরকার অনুগত সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯টি আসন লাভ করে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৩টি এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৫টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করে। এ নির্বাচনে মাত্র ৯৮৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ভোটার উপস্থিতির হার ছিল ৫৪.৯৩%।

নির্বাচন মূল্যায়ন:

স্বৈরশাসক এরশাদ যেকোন উপায়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিল। তাই দু বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আবার জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করে। কিন্তু এ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর অংশ গ্রহণ ১৯৮৬ সালের নির্বাচন থেকে কম ছিল। তেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় সাজানো একটা সমন্বিত প্রতিন্দ্বন্দ্বী জোট তৈরি করা হয়। বিরোধী দলবিহীন এক তরফাভাবে জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৮৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল উপস্থাপন করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৮৬ সালের নির্বাচনের পরেও রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা চলতে থাকে। ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে বিরোধী দলগুলো সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। এরশাদ মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হন। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক শাসনের অধীন অন্যান্য নির্বাচনের মতো এ নির্বাচনেও ভোটারদের অংশগ্রহণ খুব কম ছিল। বিরোধী দলবিহীন নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং সরকার গঠন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টি কতটি আসন লাভ করে?

(ক) ১৩৪ টি (খ) ১৬৮ টি

(গ) ২৫১ টি (ঘ) ২৬৮ টি

২। ১৯৮৮ সালের নির্বাচন প্রমাণ করে-

i. এ দেশের মানুষ গণতন্ত্রকে ভালবাসে

ii. এ দেশের মানুষ স্বৈরাচারকে পছন্দ করে না

iii. এ দেশের মানুষ সামরিক শাসনকে উৎসাহিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। কোন দু'টি সংসদ নির্বাচন মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

(ক) ১ম ও ২য় (খ) ২য় ও ৩য়

(গ) ৩য় ও ৪র্থ (ঘ) ১ম ও ৮ম

পাঠ-৮.৬ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনে এ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণআন্দোলন, স্বৈরাচার পতন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রধান উপদেষ্টা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তীব্র গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতন হয়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর নিকট উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমেদ পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ করা হয়। উপ-রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ এর নিকট রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করেন। এরশাদ এর পদত্যাগের পর উপ-রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিন জোট কর্তৃক প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা অনুযায়ী বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন।

রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলেন, তাঁর মূল কাজ হবে অতি শীঘ্র জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। রাষ্ট্র পরিচালনা ও নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য তিন জোট কর্তৃক মনোনীত ৩১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে ১৭ জনকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন তিনি। ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের তারিখ হিসেবে ঠিক করা হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান :

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সর্বমোট ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে ৩০০টি আসনে ২৭৮৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৫২.৩৭ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছেন।

নির্বাচনের ফলাফল:

১৯৯১ সালের নির্বাচনের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল-

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	আসন সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১৪০	৩০.৮১
২.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৮৮	৩০.০৮
৩.	জাতীয় পার্টি	৩৫	১১.৯২
৪.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৮	১২.১৩
৫.	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৫	১.৮১
৬.	কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি)	৫	১.৯১

৭.	গণতন্ত্রী পার্টি	১	০.৪৫
৮.	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১	০.৩৬
৯.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	১	০.২৫
১০.	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	১	০.১৯
১১..	অন্যান্য	৩	৪.৩৯
১২.	স্বতন্ত্র	০	০.০০
	মোট	৩০০	

সূত্রঃ বাংলাপিডিয়া, জুলাই-২০১৭।

নির্বাচন মূল্যায়নঃ

এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ অন্ধকার থেকে আলোতে পদার্পণ করে। বাংলাদেশে সামরিক শাসনামলের নির্বাচনগুলোতে ভোট জালিয়াতি, সন্ত্রাস, কেন্দ্র দখল মুখ্য হয়ে উঠেছিল । সেদিক থেকে ১৯৯১ সালের নির্বাচন একবারেই ব্যতিক্রম ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ইতিহাসের প্রথম নির্বাচন দেশে-বিদেশের সংবাদ মাধ্যমেও প্রশংসিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন কি কারণে অনন্য ছিল?

সারসংক্ষেপ

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির ব্যাপক আন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকার ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসের শুরুতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সে সাথে আন্দোলনের শর্ত অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। ১৯৯১ সালের ২ মার্চ তারিখে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিরোধী দল হিসেবে সংসদে যায়। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বস্তি ফিরে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৯১ সালের নির্বাচন কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়?

(ক) ১২ জানুয়ারি (খ) ২৭ ফেব্রুয়ারি

(গ) ১৮ মার্চ (ঘ) ২০ এপ্রিল

২। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

i. নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হয়

ii. সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি প্রশ্নবিদ্ধ হয়

iii. ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ কতটি আসন লাভ করে?

(ক) ৫০টি (খ) ৬৪টি

(গ) ৭৯টি (ঘ) ৮৮টি

পাঠ-৮.৭ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬ (জুন)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল ও পরিসংখ্যান জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা, স্থায়ীকরণ, ত্রয়োদশ সংশোধনী, আওয়ামী লীগ

পঞ্চম সংসদের মেয়াদ শেষ হবার কিছুদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রপতির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের তারিখ হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু সিংহভাগ রাজনৈতিক দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে এই নির্বাচন বয়কট করে। তবু বেগম খালেদা জিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভোটার ও প্রতিদ্বন্দীবিহীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বনিম্ন ভোটার উপস্থিতির এ নির্বাচন জনগণ মেনে নেয় নি। তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনের মুখে বিএনপি সরকার সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন পাস করে। বিচারপতি হাবিবুর রহমান এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মনোনয়ন পান। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান দায়িত্বই ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। সেজন্য তাঁরা নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি এবং নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের প্রতি দৃষ্টি দেন। ১৯৯৬ সালের ৮ এপ্রিল সাবেক আমলা মোহাম্মদ আবু হেনাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। নির্বাচন কমিশন ১২ জুন নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন।

নির্বাচন:

১৯৯৬ সালের ১২ জুন একটি সর্বজন গ্রাহ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ৮১টি রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে প্রার্থী ছিল ২৫৭৪ জন। যার মধ্যে ২৭৯ জন ছিল স্বতন্ত্র প্রার্থী, নারী প্রার্থী ছিল ৩৬ জন। এই নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক ৭৩.৬১ ভাগ ভোটার ভোটাধিকার প্রদান করেন। মোট নির্বাচক ছিল ৫,৬৭,১৬,৯৩৫ জন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রায় ৪ লক্ষ পুলিশ, বিডিআর ও আনসার নিয়োজিত ছিল। ১৯৯৬ এর জুনের নির্বাচনে ভোটার যেমন বেশি ছিল তেমনি দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকও অতীতের যেকোন নির্বাচনের চেয়ে বেশি ছিল।

নির্বাচনের ফলাফল:

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	আসন সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪৬	৩৭.৪৪%
২.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১১৬	৩৩.৬০%
৩.	জাতীয় পার্টি	৩২	১৬.৪০%
৪.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩	৮.৬১%
৫.	ইসলামী ঐক্য জোট	১	১.০৯%
৬.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	১	০.২৩%
৭.	স্বতন্ত্র	১	১.০৬%
৮.	অন্যান্য	০	০.০০%
	মোট	৩০০	

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০১৭।

মূল্যায়ন :

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নানা কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্ববহ করে। ১৯৯১ সালের পঞ্চম নির্বাচনের মত এ নির্বাচটিও সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হিসেবে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর পুনরায় সরকার গঠন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৯৬ সালের নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল কতটি আসন পেয়েছিল?

সারসংক্ষেপ

বিরোধী দলগুলোর প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে একদলীয় ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে স্থায়ীকরণে বাধ্য হয় বিএনপি। এই ধারাবাহিকতাতে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যা সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানে উৎখাত হওয়া বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ২১ বছর পরে পুনরায় সরকার গঠন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ কত বছর পর ক্ষমতাসীন হয়?

(ক) ১০ বছর (খ) ১৫ বছর

(গ) ২১ বছর (ঘ) ২৫ বছর

২। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতটি আসন পায়?

(ক) ১৪৬টি (খ) ১৫০টি

(গ) ২০০টি (ঘ) ১৫৮টি

৩। ১৯৯৬ (জুন) সালের নির্বাচনের তাৎপর্য-

i. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রধান দল আওয়ামী লীগের সরকার গঠন

ii. অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন

iii. আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত নির্বাচন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৮ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	চার দলীয় জোট, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সংখ্যালঘু আক্রান্ত

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০০১ সালের ১৫ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক বিচারপতি লতিফুর রহমানকে নিয়োগ দেয়া হয়। লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০১ সালের ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ হিসেবে ঘোষণা করে। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রশাসনিক বিভিন্ন রদবদল ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চলতে থাকে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান :

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ ২০০১ সালের ১৯ আগস্ট নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। ঘোষণা মোতাবেক, ২৯ আগস্ট মনোনয়নপত্র দাখিল, ৩০-৩১ আগস্ট মনোনয়নপত্র বাছাই, ৬ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ভোট গ্রহণের তারিখ ১ অক্টোবর। নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ৫৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ এককভাবে ৩০০ আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। অন্যদিকে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (নাজিউর) এবং ইসলামী ঐক্যজোট এই ৪ দল জোট হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ৩০০ আসনে সর্বমোট প্রার্থী ছিল ১৯০৩ জন যার মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৯৪ জন।

নির্বাচনে ৭৫.৫৯ শতাংশ ভোট পড়ে। মোট ২৯,৯৭৮টি ভোট কেন্দ্রে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ, আনসার, বিডিআর এবং সামরিক বাহিনীর ৫৫,০০০ সদস্য মোতায়েন ছিল।

নির্বাচনের ফলাফল :

নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত তথ্য মতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট সর্বাধিক ২১৬টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে বিএনপি পায় ১৯৩টি, জামায়াতে ইসলামী ১৭টি, জাতীয় পার্টি (নাজিউর) ৪টি এবং ইসলামী ঐক্যজোট ২টি আসন। নির্বাচনের প্রধান অপর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ মাত্র ৬২টি আসন লাভ করে।

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	আসন সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১৯৩	৪০.৯৭
২.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬২	৪০.১৩
৩.	ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৪	৭.২৫
৪.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৭	৪.২৮
৫.	বাংলাদেম জাতীয় পার্টি (এন-এফ)	০৪	১.১২
৬.	ইসলামী ঐক্য জোট	০২	০.৬৮
৭.	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	০১	০.৪৭

৮.	জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	০১	০.৪৪
৯.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	০	০.২১
১০.	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	০	০.১০
১১.	স্বতন্ত্র	০৬	৪.০৬
	মোট	৩০০	

সূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০১৭ ।

নির্বাচন মূল্যায়নঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় এ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচনে কারচুপি ও দলীয় কর্মীদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়ার অভিযোগ ওঠে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদেরকে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়ার অভিযোগও আসে। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০০১ সালের নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিয়ে বেশ বির্তক দেখা দেয়। এছাড়াও নির্বাচন পরবর্তী কয়েক দিন দেশের নানা স্থানে নির্বাচনে বিজয়ী চারদলীয় জোটের লোকজন পরজিত দলের নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের উপর নজির বিহীন হামলা চালায়। এসব সহিংসতার বিরুদ্ধে লক্ষণীয় ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয় সরকার।

শিক্ষার্থীর কাজ	২০০১ সালের নির্বাচনী কর্মকান্ড বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনটি কম গ্রহণযোগ্যতা পায়। বিশেষ করে, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আনীত অভিযোগ ও নির্বাচন পরবর্তীতে সংখ্যালঘুদের উপরে ভয়াবহ হামলার ঘটনায় এই সরকার সমালোচনায় পড়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ২০০১ সালের নির্বাচনে কতটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে?
(ক) ৫০টি (খ) ৫২টি
(গ) ৫৪টি (ঘ) ৬৪টি

২। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক জোট/দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?
(ক) আওয়ামী লীগ (খ) জাতীয় পার্টি
(গ) ৪ দলীয় ঐক্যজোট (ঘ) জাকের পার্টি

৩। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর যা ঘটে-
(ক) সংখ্যালঘুদের উপর ভয়াবহ হামলা (খ) সংখ্যালঘুদেও নিরাপত্তা বৃদ্ধি
(গ) আওয়ামী লীগের সরকার গঠন (ঘ) নির্বাচনের গুণগান

পাঠ-৮.৯ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জরুরি অবস্থা, সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক, মাইনাস টু ফর্মূলা, নির্বাচন

বেগম খালেদা জিয়া ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রধামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মানুযায়ী পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় প্রধান উপদেষ্টা কে হবেন তা নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। তৎকালীন বিরোধীদলগুলো অভিযোগ করে যে বিএনপির পছন্দসই বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করার জন্য সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতিদের অবসরের বয়স ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ করা হয়। এর ফলে বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। তাছাড়া হাইকোর্টের বিতর্কিত বিচারপতি এম এ আজিজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। এ দুটি বিষয়ে আওয়ামী লীগসহ সিংহভাগ রাজনৈতিক দলের আপত্তি ছিল। বিচারপতি কে এম হাসানকে নিয়ে আপত্তির মুখে রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা করেন। ৩১ অক্টোবর তিনি ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ বিএনপির নির্দেশে একতরফাভাবে কাজ করছিলেন এমন অভিযোগে ৪ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। ভোটার তালিকা প্রণয়নে এম এ আজিজের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উঠে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটসহ বিরোধী দলের হরতাল অবরোধের মুখে এম এ আজিজ পদত্যাগ করেন। নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহফুজুর রহমান ২২ জানুয়ারি নির্বাচনের দিন ধার্য করেন। কিন্তু মহাজোটসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এই দাবির সাথে বিদেশি কূটনীতিকগণও সব দলের অংশ গ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাগিদ দিতে থাকে। ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিএনপিও ২২ জানুয়ারি তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অনড় অবস্থান নেয়। ৪ দলীয় জোট ও মহাজোটের এই মুখোমুখি অবস্থায় দেশ সঙ্কটময় পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হয়। সমগ্র দেশে একটা থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে। ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১২ জানুয়ারি এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমেদকে নতুন প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠান:

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ৩৮ টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে এবং ভোট প্রদানের হার ছিল ৮৭.১৬ ভাগ। এ নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী ছিল ১৫৬৭ জন। যার মধ্যে ৫৯ জন মহিলা প্রার্থী ছিলেন।

নির্বাচনের ফলাফল:

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	আসন সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩০	৪৮.০৪%
২.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০	৩২.৫০%
৩.	জাতীয় পার্টি	২৭	৭.০৪%
৪.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৩	০.৭২%
৫.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২	৪.৭০%

৬.	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	২	০.৩৭%
৭.	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১	০.২৭%
৮.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	১	০.২৫%
৯.	স্বতন্ত্র	৪	২.৯৪%
১০.	অন্যান্য	০	২.২৫%
১১.	না ভোট	--	০.৫৫%
	মোট	৩০০	১০০%

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০১৭।

নির্বাচন মূল্যায়ন:

২০০৮ সালের নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুন:প্রতিষ্ঠায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিকল্প উদ্ভাবনের বিষয়টিও রাজনৈতিক দলের চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, অনেক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কেননা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত ৯০ দিনের জায়গায় নানা কৌশল অবলম্বন করে প্রায় দুই বছর ক্ষমতায় থাকে। এই আমলেই দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতা শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করার লক্ষ্যে কথিত 'মাইনাস টু ফর্মূলা' বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	'মাইনাস টু ফর্মূলা' কী?

সারসংক্ষেপ

২০০৮ সালের নির্বাচনটি বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রর্বতনের সংগ্রামে আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বস্তুত, নানা কৌশল অবলম্বন করে প্রায় দুই বছর যাবৎ ক্ষমতা দখলে রাখা এবং মাইনাস টু ফর্মূলা'র মাধ্যমে দেশকে রাজনীতিশূন্য করার চেষ্টা করেন। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাটি বিতর্কিত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে এসে রাজনৈতিক দলগুলোর চাপের মুখে নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-
(ক) ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ (খ) ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮
(গ) ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৮ (ঘ) ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৮

২। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল/জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?
(ক) চার দলীয় ঐক্যজোট (খ) মহাজোট
(গ) এল.ডি.পি (ঘ) স্বতন্ত্র

৩। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল-
i. 'না' ভোটের প্রবর্তন
ii. গণতন্ত্রের উত্তরণের পথিকৃৎ
iii. তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিহীন নির্বাচন

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.১০ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিরোধী দলীয় আন্দোলন, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, সহিংস

২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ১৮ দলীয় জোট এর প্রতিবাদ জানায় এবং আন্দোলন গড়ে তোলে। পশ্চিমা বিশ্বের কূটনীতিকগণ সর্বাধিক রাজনৈতিক দলের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশেষ করে জাতিসংঘের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত তারানকো দুইবার বাংলাদেশে আসেন। তিনি প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংলাপের ব্যবস্থা করেন। রাজনৈতিক দল দুটি সমঝোতায় পৌছানোর কথা বললেও শেষ পর্যন্ত কোন সমঝোতা হয় নি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার স্বাভাবিক সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে। ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি। ১৮ দলীয় জোট যেকোন মূল্যে নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। সারা দেশে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। জান-মাল, ঘরবাড়ি ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠানঃ

বিরোধীদের নির্বাচন বাতিলের সব ধরনের চেষ্টার মধ্যেই ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলি অংশ নেয় নি। বিরোধী দলীয় সহিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার আবহ না থাকায় অন্যান্য বারের তুলনায় এ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি অত্যন্ত কম ছিল। ইতিহাসে সর্বোচ্চ ১৫৩ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচনে নির্বাচিত হয়।

নির্বাচনের ফলাফলঃ

নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ-

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	আসন সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩৪	৭২.১৪%
২.	জাতীয় পার্টি	৩৪	৭.০০%
৩.	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৬	২.১০%
৪.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৫	১-১৯%
৫.	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	২	১.০৪%
৬.	জাতীয় পার্টি-জেপি	২	০.৭৩%
৭.	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	১	০.৬৩%
৮.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	০	০.০৪%
৯.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	০	০.০৩%
১০.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	০	০.০২%

১১.	গণফ্রন্ট	০	০.০২%
১২.	গণতন্ত্রী পার্টি	০	০.০১%
১৩.	স্বতন্ত্র	১৬	১৫.০৬%
	মোট	৩০০	১০০%

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০১৭।

নির্বাচন মূল্যায়ন:

২০১৪ সালের নির্বাচন অনেক বির্তকের জন্ম দিয়েছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি সাহসী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর মতানৈক্যের কারণে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন ও পদ্ধতি উভয়ই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বাংলাদেশ সফরত ব্রিটিশ উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এ্যালান ডানকান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচন সাংবিধানিক হলেও অস্বাভাবিক।

অতএব বলা যায়, বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে এখনও সংশয় কাটেনি। স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরও বাংলাদেশের জনগণ এখনও একটি আস্থাশীল নির্বাচনী ব্যবস্থা পায় নি।

শিক্ষার্থীর কাজ	দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন দলগুলোর ব্যাপক সহিংসতার মধ্যে ৫ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়। একদিকে ব্যাপক সহিংসতা ও অন্যদিকে বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণে এ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত কম। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে সরকার গঠন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত তারিখে?

(ক) ১ জানুয়ারি, ২০১৪ (খ) ১০ জানুয়ারি, ২০১৪

(গ) ৫ জানুয়ারি, ২০১৪ (ঘ) ৭ জানুয়ারি, ২০১৪

২। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ কতটি আসন লাভ করে?

(ক) ২৩০টি (খ) ২৩৪টি

(গ) ২৩৬টি (ঘ) ২৩৮টি

৩। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল-

i. ১৫৪ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়

ii. বিএনপি নির্বাচন বর্জন করে

iii. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৩২টি আসন লাভ করে-

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.১১ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, ভোটার তালিকা, মত বিনিময়, সমন্বয়

সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হল নির্বাচন কমিশন। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচনী সংস্থা সর্বেসবা। বাংলাদেশের সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ এর বিকল্প নেই। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন স্থানীয় ও জাতীয় উভয় ধরনের নির্বাচনই করে থাকে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ, জনসচেতনতা তৈরিসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম করে থাকে। নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার এ জন্য নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ ভূমিকা পালন করতে পারে-

সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়নঃ

ভোটার হল নির্বাচনের প্রাণ। ভোটার তালিকাতে সঠিকভাবে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের অন্তর্ভূক্তি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনও এ বিষয়ে ইতোপূর্বে সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। ২০০৭ সালে ড. এ টি এম শামসূল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে সঠিক একটি তালিকা প্রণয়ন করেছিল। ফলে ২০০৮ সালে একটি শান্তিপূর্ণ ও সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতির একটি নির্বাচন হয়।

রাজনৈতিক দলের সাথে মত বিনিময়ঃ

রাজনৈতিক দলের সাথে মত বিনিময় করে সুষ্ঠু নির্বাচনের আবহ তৈরি করা নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সকল মত ও পথের দলগুলির আস্থাভাজন হতে পারার মধ্যেই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা অনেকাংশে নিহিত থাকে।

দক্ষ কর্মী তৈরিঃ

নির্বাচন কমিশনের পরিসর অনেক বৃহৎ। কিন্তু প্রায়শই দক্ষ জনবলের অভাবে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ সঠিক সময়ে যথাযথভাবে হয় না। ভোটাররা নানাভাবে হয়রানির স্বীকার হয়। তাছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধি, আইন-কানুন সম্পর্কেও হালনাগাদ তথ্য অনেকের জানা থাকে না।

স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যথাযথ সমন্বয়ঃ

সাংবিধানিকভাবেই শাসন বিভাগ নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা করবে বলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই নানা কারণে স্থানীয় প্রশাসন অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে স্থানীয় নির্বাচন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কোনঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে নির্বাচনের সময় একটি সমন্বয়হীনতার অভাব দেখা দেয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় নির্বাচন কার্যালয়কে ক্ষমতা অর্পণ করা হলে সমন্বয় সুষ্ঠু হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

ভোটাদের সাথে মত বিনিময়ঃ

সচেতন ভোটার নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। নির্বাচন কমিশন নিয়মিতভাবে সভা, সেমিনার, শোভাযাত্রা করে ভোটারদেরকে সচেতন করতে পারে। এর ফলে সৎ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে ভোটাররা উৎসাহিত হয়।

নির্বাচনে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগঃ

নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। বাংলাদেশে ২০০৭ সালে ভোটার তালিকা প্রণয়নে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সঠিকভাবে একটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। নির্বাচনের সময়ও নির্বাচন কমিশন আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই অন লাইনে ভোটিং ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন এর ব্যবহার হচ্ছে।

তাই বলা যায়, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকার অনেক সময়ই নির্বাচন প্রভাবিত করে। তবে নির্বাচন কমিশন তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচন অনেকটাই সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

নির্বাচন কমিশন হচ্ছে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিকবাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যেকোন ধরণের হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করা উচিত। বাংলাদেশের মত একটি উদীয়মান গণতান্ত্রিক দেশে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো-

i. নির্বাচন অনুষ্ঠান করা

ii. নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারন

iii. ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) ii ও iii (খ) i ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) i ও iii

২। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে যে ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে-

i. ভোটার তালিকা বিধিমালা সংশোধন

ii. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

iii. রাজনৈতিক দলের সাতে মত বিনিময়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii (ঘ) iii

পাঠ-৮.১২ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের ভূমিকা জানতে পারবে।
- সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নাগরিকের ভূমিকা বলতে পারবে।

মুখ্য শব্দ	হস্তক্ষেপ, জনবল, জনসচেতনতা, বাজেট, নাগরিক দায়িত্ব, প্রশিক্ষণ

সরকারের ভূমিকা

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন, সাংবিধানিক ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ নির্বাচন কমিশনকে কাঙ্খিত সহযোগিতা করতে বাধ্য। তাছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো বৃহৎ নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে কঠিন। নির্বাচনের প্রাণ হল ভোটার অর্থাৎ জনগণ। তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য জনগণের সহযোগিতাও অপরিহার্য। নিম্নে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা আলোচনা করা হল।

হস্তক্ষেপ না করা: বাংলাদেশে বিতর্কিত নির্বাচনের মূল কারণ হল সরকারের হস্তক্ষেপ। সরকার অনেক সময় বিভিন্নভাবে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচন কমিশন গঠন, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের মত বিষয়গুলোতে সরকারের হস্তক্ষেপ এর নজির দেখা যায়। এসবের ফলে নির্বাচন কমিশনের প্রতি জন আস্থার অভাব সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে দেখা যায়, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারে। তাই প্রত্যেক ক্ষমতাসীন দলের উচিত নির্বাচন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।

পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ: নির্বাচন কমিশনে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। জনবল ঘাটতির কারণে নির্বাচন কমিশনকে বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলো পরিচালনা করতে বেগ পেতে হয়।

আইনের যথাযথ প্রয়োগ: বাংলাদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত অনেক আইন ও বিধি রয়েছে। কিন্তু অনেক সময়ই এর যথাযথ প্রয়োগ দেখা যায় না। এর একটি কারণ তা হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ ব্যাপারে সচেতন না হলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এককভাবে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো অসম্ভব।

নির্বাচনে সামরিক বাহিনী মোতায়েন না করা: সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের গর্ব। তাঁদেরকে বেসামারিক প্রয়োজনে যত কম নিয়োগ করা যাবে তাদের পেশাদারিত্ব তত মজবুত হবে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে পরিচালনা করতে পারলে নির্বাচনী শৃঙ্খলা বজায় অসাধ্য নয়।

নাগরিকের ভূমিকা

সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নাগরিকদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁরাই প্রার্থী তাঁরাই ভোটার। ফলে নাগরিকগণ যদি সচেতন ও সৎভাবে দায়িত্ব পালন করে তবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা সহজ হয়। নিচে এ ব্যাপারে নাগরিকদের ভূমিকা আলোচনা করা হল-

ভোটার তালিকা প্রণয়নে কমিশনকে সহযোগিতা: নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে বিজ্ঞপ্তি ও মাইকে ঘোষণা দিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা রাখে। নিকটবর্তী নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ভোটার নিবন্ধনের কাজ হয়ে থাকে। তাই ১৮ বা তার বেশি বয়সের সকল নাগরিকের উচিত সেখানে গিয়ে ভোটার নিবন্ধন করা।

নির্বাচনী আচরণবিধি অনুসরণ করা: প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ সাধারণ জনগণ নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চললে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী মাঠে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব খাটিয়ে আচরণবিধি ভঙ্গ করে। যেমন অর্থ ও

পেশী শক্তির ব্যবহার, যততত্র পোস্টার লাগানো, যখন তখন মাইকে প্রচার, অবৈধ অস্ত্র বহন ছাড়াও নানাভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়ে থাকে। সচেতন নাগরিকদের উচিৎ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

বিবেকবান ভোটার হওয়া: সচেতন ও বিবেকবান ভোটার দেশের সম্পদ। কেননা তাঁদের মাধ্যমে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া সম্ভব। যোগ্য প্রতিনিধি দেশ ও জনগণের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। অসৎ পন্থা বা প্রলোভনে সহায়তাকারী ভোটার কখনো যোগ্য প্রার্থী বাছাই করতে পারে না। এ ধরনের অসচেতন ভোটারের কারণে দেশের ক্ষতি হয়।

পরিশেষে বলা যায়, নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য সরকার ও নাগরিক উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একদিকে সরকার নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি সহযোগিতা করতে পারে। এক্ষেত্রে সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপকে পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যদিকে, জনগণ সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অতন্ত্রী প্রহরী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নাগরিকগণ নির্বাচন কমিশনকে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে?

সারসংক্ষেপ

নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। কিন্তু সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দল ও সরকারের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো সহযোগিতা করেছিল বলেই ১৯৯১, ১৯৯৬ (জুন), ২০০১ এবং ২০০৮ সালের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছিল। অন্যদিকে তাদের অসহযোগিতার কারণে ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯৬ (ফেব্রুয়ারি) ও ২০১৪ সালের নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল, জনগণ, সরকার এবং নির্বাচন কমিশন এ সবগুলো মাধ্যমের বলিষ্ঠ ভূমিকা নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোনটির গুরুত্ব অপরিসীম?

(ক) আমলাদের (খ) সরকারের

(গ) নাগরিকের (ঘ) রাজনৈতিক দলের

২। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আরো গতিশীল হয়-

i. সরকারের কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলে

ii. নির্বাচনের সকল দলের অংশগ্রহণের ফলে

iii. নির্বাচন বর্জন করার ফলে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। নির্বাচনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন কেন?

(ক) রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য (খ) সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য

(গ) ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করার জন্য (ঘ) অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

'ক' নামক রাষ্ট্রের ৫ম নির্বাচনটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকরা গোপনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।

১। অনুচ্ছেদে কী ধরণের ভোটাধিকারের চিত্র ফুটে উঠেছে?

(ক) বিশেষ ভোটাধিকার (খ) যৌথ ভোটাধিকার

(গ) সরল ভোটাধিকার (ঘ) সার্বজনীন ভোটাধিকার

২। উদ্দীপকের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে-

i. গোপন ভোটদান

ii. সার্বজনীন ভোটাধিকার

iii. স্তরভিত্তিক ভোটদান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii ও iii (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

৩। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হল-

(ক) আওয়ামী লীগ ২৯৩টি আসন পায়

(খ) সিপিবি ৪টি আসন পায়

(গ) বিএনপি ৩০টি আসন পায়

(ঘ) জাতীয় পার্টি ১৫টি আসন পায়

৪। ২০০৬ সালের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়-

i. আওয়ামী লীগ

ii. বিএনপি

iii. সিপিবি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫নং ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের একটি অঞ্চলের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ভীত হয়ে নির্বাচনে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

৫। উল্লেখিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বক্তব্যটি প্রযোজ্য?

(ক) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন (খ) সুষ্ঠু নির্বাচনি পরিবেশের অনুপস্থিতি

(গ) স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন (ঘ) দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন

৬। এ ধরণের পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ পেতে হলে-

i. শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে

ii. সকল নাগরিকদের সচেতন হতে হবে

iii. রাজনৈতিক দলগুলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। গণতন্ত্র অর্থই হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপর। নির্বাচনের মাধ্যমে নাগরিকগণ পছন্দমত প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য ভোট প্রদান করেন।

(ক) নির্বাচন কী?

(খ) বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(গ) নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

২। 'ক' নামক রাষ্ট্রের প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার রয়েছে। কিন্তু এ রাষ্ট্রের নাগরিকগণ নির্বাচন সম্পর্কে উদাসীন। বেশিরভাগ নাগরিক নির্বাচনের প্রচারণার দিকে খেয়াল রাখে না। এছাড়া তারা প্রার্থী সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হতে আগ্রহী নয়।

(ক) বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?

(খ) বাংলাদেশ ভোটার হতে গেলে একজন নাগরিকের কী কী যোগ্যতা থাকতে হয়?

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার পার্থক্য বর্ণনা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রে নাগরিকদের নির্বাচন সম্পর্কে অনীহার কী কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৩। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে গণতন্ত্র বার বার হোঁচট খেয়েছে। ১৯৭৫ সালের সামরিক শাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে থেকে দীর্ঘ ১৫ বছর বাংলাদেশের গণতন্ত্র সামরিক শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়। ১৯৯১ সাল থেকে পর পর তিনটি নির্বাচন সুষ্ঠু হলেও ২০০৬ সালে আবার জটিলতা দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই বছর ক্ষমতা দখলে রাখে।

(ক) ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় কে ক্ষমতায় ছিলেন?

(খ) তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাব বার পিছিয়ে যায় কেন?

(গ) ২০০৬ সালে কেন দুইটি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন জটিলতার একটি বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। ঘ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ ঃ ১। গ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১০ ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১১ ঃ ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১২ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। খ ৬। ঘ